বিজয়গুপ্তের বেহুলা: স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে

তরুণকান্তি মন্ডল*

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরসুনা কলেজ, ই-মেইল- tarunmandal12@gmail.com

সারসংক্ষেপ: লোকায়ত দেবদেবীনির্ভর মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মৃত স্বামী লখিন্দরের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ক্রমাগত সংগ্রাম করে গেছে। বেহুলার ত্যাগ, তিতিক্ষা, আত্মসংযম ও কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মঙ্গলকাব্যধারায় নারীচেতনাবাদের আলোয় অসামান্যা নারী বেহুলা।

সূচক শব্দ: নারী, ত্যাগ, সঙ্কট, আত্মমর্যাদা

মূল আলোচনা:

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে মঙ্গলকাব্য। এক ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যে লৌকিক ও পৌরাণিক দেবকল্পনার মিশ্রণ ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যের সামাজিক পরিমণ্ডল, নানা দার্শনিক প্রেক্ষাপট, ভিন্ন ভিন্ন জীবনবোধ ও মতাদর্শের টানাপোড়েন, রচনা পরিবেশনের রীতি— এসব কিছু স্মরণে রাখলে বোঝা যায় এই সব সাহিত্য নারীবাদী আলোচনার ক্ষেত্রে গভীর কৌতূহলের বিষয় হতে পারে। মঙ্গলকাব্যের পুরুষ কবিরা নারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কাব্য রচনা করেছেন। লোকায়ত দেবদেবী নির্ভর মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে মনসামঙ্গল কাব্য। জলাজঙ্গল পরবেষ্টিত বাংলার ভৌগোলিক যে পরিবেশ, সেখানে মনসামঙ্গল কাব্যের একাধিপত্য হওয়াই স্বাভাবিক। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ট কবি রূপে চিহ্নিত। এই কাব্যে বেহুলা সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত সংগ্রাম করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যত নারী চরিত্র আছে তার মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত চরিত্র হল বেহুলা। একদিকে পৌরাণিক আদর্শ, অন্যদিকে লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব যুগপৎ আত্তীকরণ করে সৃজিত হয়েছে বেহুলা।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের ইচ্ছাপূরণের নির্মমতায় আক্রান্ত হন মর্ত্যবাসী। মনসামঙ্গলের কাব্যের কাহিনি দেবী মনসার চাঁদ সদাগরকে তাঁর কাছে নতি স্বীকার করানোর একান্ত প্রয়াস এবং মনসার সেই প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ করা শুধু নয়, তীব্র ক্ষোভ ও বিদ্রোহ ঘোষণরাই কাহিনি। মনসামঙ্গল কাব্য তাই দেবী মনসার নয়, বেহুলার জয়গানে উদ্ভাসিত। বেহুলা চরিত্র আলোচনায় ড. গোপাল হালদার মন্তব্য করেছেন—

> "এ কাহিনীতে মনসার বিজয়ও ততটা বলা যায় না। এখানে আসল বিজয় বেহুলারই। কারণ ক্রূর আক্রোশময়ী মনসাদেবী সেদিনের অত্যাচারী, স্বৈরতন্ত্রী রাজশক্তির মতো শেষ পর্যন্ত যথেচ্ছ শক্তির দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেন; ভক্তি বা শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় তিনি উদ্রেক করতে পারেন না।"[১]

বেহুলা নিজের অসামান্য কার্যক্ষমতা ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যের গুণে একই সঙ্গে রোষদীপ্তা মনসাকে জয় করেছে ও হিমালয়ের মতো কঠিন শ্বশুরের হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছে। দেবনির্ভর সমাজের কবি বেহুলাকে আদর্শ নারী চরিত্র হিসেবে কল্পনা করতে গিয়ে তাকে একান্তভাবে দৈব অনুগৃহীত করেই এঁকেছেন এবং সেই দৈব অনুগ্রহ সে লাভ করেছে চরম ত্যাগ ও পরম কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে। যে বেহুলা রূপে অতুলনীয়া, গুনে অদ্বিতীয়া, স্বামীসঙ্গ সুখলাভ তার ভাগ্যে ঘটেনি, বরং মৃত পতি কোলে তৎকালীন সমাজমানসের প্রতিভূ কবি তাকেই ভাসিয়েছেন সকল পরিচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-সাহচর্যের বাইরে এক অপরিচিত অশেষ কৃচ্ছসাধনের মধ্যে। বেহুলা ত্যাগ, তিতিক্ষা, কঠিন আত্মসংযম ও কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। লখিন্দরের যা ভবিতব্য তা কিন্তু চাঁদসদাগর গোপন করেননি বেহুলার কাছে। মৃত্যু বিধান জেনেও অমরপ্রেমের বার্তাকে মৃত্যুর কাছে নতিস্বীকার করানোর মতো মানসিক কার্পণ্য দেখায়নি বেহুলা। মনসা চক্রান্ত করে বেহুলার চোখে বুলিয়ে দিলেন ঘুমের কাজল। ঘুম ভাঙল কালনাগিনীর দংশনের আঘাতে ছটফট করে ওঠা লখিন্দরের আর্তনাদে। কয়েক মুহূর্তেই লখিন্দর ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। বেহুলার বাসর গড়ার সাধ অপূর্ণই থেকে যায়। এরমধ্যেই সন্তানহারা শাশুড়ির সমদুয় আক্রোশ বেহুলার প্রতি নিবদ্ধ হয়—

> "সোনাই বলে বেউলা তুই লঘুচর জাতি।
> বিহার রাত্রে খাইলা পতি নহে বাসি রাত্রি।।[২]

সারাজীবন বৈধব্য যন্ত্রণা নিয়ে শ্বশুরালয়ে বা পিত্রালয়ে থাকা বেহুলার অভিপ্রেত নয়। স্বামীর পুনর্জীবন লাভের আত্মবিশ্বাস তারমধ্যে দৃঢ়মূল হয়েছে। মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে ছয়মাস কলার মান্দাসে দুর্যোগপূর্ণ উত্তাল সমুদ্রে ভেসেছে। বেহুলার এই যে ভাসানযাত্রা তাকে নারীর সতীত্বের চরম আদর্শ রূপে উপস্থাপন করেছেন মধ্যযুগের কবিরা। কবি ভাসানযাত্রার পথের দুধারে অঙ্কন করেছেন বিবিধ প্রতিকূলতার চিত্র। মনসা বিভিন্ন পশুপাখির ছদ্মবেশে হরণ করতে চেয়েছেন লখিন্দরের দেহ। আবার কখনো লম্পট পুরুষ এসেছে বেহুলার রূপে আকর্ষিত হয়ে। বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে মৃতপতি কোলে একাকিনী ভাসমান সাহসিনী বেহুলা এই ঘোর বিপদেও একবারের জন্য ব্যক্তিত্ব হারায়নি বা বুদ্ধিহত হয়নি। বরং এই নিদারুন সঙ্কটে বারবার উত্তীর্ণ হয়েছে বুদ্ধি ও সাহসের দ্বারা।

বহু সঙ্কটের আবর্তে উত্তীর্ণ হয়ে বেহুলা দেবপুরীতে পৌঁছলেও আবার নতুন সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। যে দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে সে স্বামীর পুনর্জন্মের বরপ্রার্থী, সেই মহাদেবই তার রূপেগুণে নৃত্যগীতে সন্তুষ্ট হয়ে তার সতীত্ব নাশ করতে চেয়েছে। প্রত্যুৎপন্নমতি বেহুলা নিজ বুদ্ধির দীপ্তিতেই এই বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে। বহু কষ্টভোগের পর দেবসভায় সকলকে নৃত্যগীতে তুষ্ট করে মৃত স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করার মতো

কঠোর কাজে সমর্থ হয়েছে। বেহুলা নিজের স্বামীকে ফিরে পেয়েই সন্তুষ্ট হয়নি, তারই মতো অকালে বৈধব্যের জ্বালায় জর্জর যে আরও ছয়জন জা তাদের স্বামীরও পুনর্জীবন কামনা করেছে। বেহুলা নিজের সৌভাগ্যের আলোয় অন্যের দুর্ভাগ্যের কালিমা গাঢ়তর হোক, এটা কখনই কামনা করেনি বরং সকলের সঙ্গে সৌভাগ্যকে ভাগ করে ভোগ করতে চেয়েছে।

দৈবনির্ভর সমাজের ততোধিক দৈব অনুগত নারীকুলে এক ব্যতিক্রমী নারী বেহুলা। দৈবশক্তিকে অজেয় বা অপ্রতিরোধ্য বলে মেনে নেয়নি বরং সাধারণ সুখ দুঃখের প্রতি মোহহীন হয়ে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দৈবের উপর নিজের বিজয় প্রতিষ্ঠা করেছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়—

> ‘‘ছয় অকাল বিধবা পুত্রবধূর গভীর মৌনবেদনা চাঁদসগারের সংসারে যেন এই গতানুগতিক দুঃখ সহনশীলতার বিরুদ্ধে বেহুলা প্রতিবাদ জানাইতে আসিল।’’[৩]

সাপের কাটা লেজ দেখিয়ে বেহুলা সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে মনসার এই যুদ্ধ যে অন্যায় তা প্রতিপন্ন করে দেবসভায় সুবিচার পেয়েছে। বুদ্ধিমত্তা সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় বেহুলা অসাধ্য সাধন করেছে এবং আনন্দধারায় আপ্লুত হয়েছে শুধু সদাগর পরিবারই নয় সমগ্র চম্পক নগরীর জীবনধারা। বেহুলা অনুরোধেই চাঁদসদাগর মনসাকে পূজা করতে সম্মত হয়েছে। বেহুলা ব্যক্তিত্বের তেজ, ধৈর্য, পরিবারের প্রতি আনুগত্য মনসাকে জীবনের মাঙ্গলিক দিকটির সন্ধান দিয়েছে। সদ্যবিধবা যুবতী সমগ্র সন্তাপ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবনের জন্যে নৃত্য-গীতের আদেশ পালন করেছে এঘটনাও মনসার কাছে অপার বিস্ময়। লখিন্দরের পুনর্জীবন দানের আগে মনসার প্রস্তর কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে।

নারী স্বাধীনতার যে প্রথম এবং প্রধান অঙ্গীকার আত্মমর্যাদাবোধ যা সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় লুপ্ত হয়েছিল বহুশতাব্দী আগেই, মঙ্গলকাব্যের নারীসমাজ মানসে সেই হৃত সম্মানবোধ সূচিত হয়েছিল। অসাধ্যসাধন পটীয়সী বেহুলা মৃত স্বামীকে জীবিত করেছে তার চারিত্রিক দৃঢ়তার গুণে, সতীত্বের ক্ষমতা বলে কিন্তু সতীত্বকেই আবার প্রমাণ করার দাবি উঠেছে। নিজ মহিমা প্রতিষ্ঠাকল্পে বেহুলা সে দাবি পূরণ করেছে ঠিকই কিন্তু এতবড় অপমান নিঃশব্দে মেনে নেয়নি। পরীক্ষা উত্তীর্ণা বেহুলা সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে সবার চোখের সামনে দিয়ে স্বর্গলোকে অনায়াসে চরণ ফেলেছে। জয়া সেনগুপ্ত সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন—

> ‘‘নারীর হৃত আত্মসচেতনতা তথা আত্মমর্যাদাতাবোধ যেন আভাসে ইঙ্গিতে মূর্ত হয়ে উঠতে চেয়েছে বহু শতাব্দী পরের কবি কল্পিত বেহুলা চরিত্রে।’’[৪]

আর এজন্যই সুদীর্ঘ সুকঠোর সংগ্রাম অন্তে বহুপথ অতিক্রম করে সাফল্য এলেও আত্মসম্মানবোধে উজ্জীবিত নারী বেহুলা মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে চিরতরে অন্তর্হিতা হয়েছে। আজও আদর্শায়িত নারী চরিত্র হিসাবে সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয় বেহুলার নাম। সাহিত্যের নারীর ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে দেবীত্বের শিখরে। সেই

শিখরের সামনে আধুনিক যুগও সমানভাবে নতমস্তক, এখানেই মধ্যযুগের অন্যান্য নারী চরিত্রের তুলনায় বেহুলার শ্রেষ্ঠত্ব।

তথ্যসূত্র:

১. হালদার ড. গোপাল, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, অ্যালায়েড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৫৬

২. দাশগুপ্ত ড. জয়ন্তকুমার, বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ', 'অনিরুদ্ধ ঊষা হরণ ও সমযুদ্ধ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৪৩৫

৩. ভট্টাচার্য ড. আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪২৪

৪. সেনগুপ্ত জয়া, মঙ্গলকাব্যের সামাজিক পটভূমিকা ও নারী, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৮১